তুলি-কলম

‘বিচিত্রিতা’ : রবীন্দ্রনাথের ছবি ও কবিতা

গৌতম কুমার মণ্ডল

রবীন্দ্রনাথের ‘পূরবী’র পাণ্ডুলিপিতে আঁকিবুঁকি আর বিভিন্ন রূপ তৈরির আভাস লক্ষ করেছিলেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (১৮৯০-১৯৭৯)। সেটা ১৯২৪ সাল। অসুস্থ কবি তখন ওকাম্পোর আতিথ্যে মাস দুয়েক বিশ্রাম নিচ্ছিলেন আর্জেন্টিনার সান ইসিদ্রোতে। ওকাম্পোর প্রেরণাতেই রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার নেশা যেন বেড়ে যায়। ১৯২৮ সাল থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথকে সচেতন চিত্রশিল্পী হিসেবে পেলাম। ১৯২৮-৩০ সালের আঁকা ছবি নিয়ে ওকাম্পোরই উদ্যোগে চিত্রশিল্পের অন্যতম সমঝদার শহর প্যারিসের সিগাল গ্যালারিতে কবির আঁকা ছবির প্রথম প্রদর্শনী হয়।

এরপর থেকে ছবির নেশায় যেন পেয়ে বসে কবিকে। তাঁর ছবির প্রদর্শনী হতে থাকে বিশ্বের নানা প্রান্তে। শিল্পের সমঝদার মানুষ তাঁর ছবি দেখে মুগ্ধ হন। কবিতা থেকে ছবির দিকে কবির মন ঘুরে যায়। কবির মনে এই ভাবনাও কার্যকরী হয় যে ছবির একটি চিরন্তন মূল্য আছে। কিন্তু গীতিকবিতা একান্তই ভাষা দিয়ে গড়া শিল্প, আর ভাষার আবেদন ক্রমশ পরিবর্তিত হয়। রাণী চন্দের ‘আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে দেখি এর কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘‘গীতিকাব্যের অনির্বচনীয়তা ফুটে ওঠে ভাষার ব্যঞ্জনার দ্বারা। ভাষা কালে কালে বদল হয় ও সেইসঙ্গে রসের সৌন্দর্য, গৌরব কমে যায়। এ কালের রস ভাবীকালের মানুষ পায় না, তার উজ্জ্বলতা, তার স্বাদ ক্রমেই ম্লান হয়ে আসে, ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে।’’ হয়তো একারণেই কবির ক্রমশ ছবির দিকে চলে আসা। ১৯২৮ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রায় আড়াই হাজার ছবি আঁকলেন। এমনকী কবিতাতেও এল ছবির প্রভাব। ছবি নিয়েও লিখলেন কবিতা। আমরা এ-প্রসঙ্গে কবির ‘বিচিত্রিতা’ কাব্যের কথা বলব।

‘বিচিত্রিতা’র প্রথম সংস্করণের (শ্রাবণ ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ) পর বইটি আর প্রকাশিত হয়নি। এটি একটি ছবি ও কবিতার বই। এক-একটি চিত্রের জন্য এক-একটি কবিতা আছে এখানে। ছবি ও কবিতা উভয়ই সমান মূল্যবান। প্রাসঙ্গিক ছবিগুলি ছাড়া ‘বিচিত্রিতা’ পড়ে মজা নেই। ছবি ও কবিতার এক সুন্দর সহাবস্থান এটি। কিন্তু বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীতে যখন ‘বিচিত্রিতা’ অন্তর্ভুক্ত হয় তখন ছবিগুলিকে গ্রহণ করা হয়নি; শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের

'বিচিত্রিতা' ছবিটি ছাড়া। তাই রবীন্দ্ররচনাবলীর 'বিচিত্রিতা' যেন একটি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ। যদিও রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ''ছবি না দেখিলেও 'বিচিত্রিতার' কবিতার রসগ্রহণে কোনো বাধা হয় না।'' ছবিগুলির সঙ্গে কবিতা মিলিয়ে পড়ার পর আমাদের অন্তত তা মনে হয় না। কয়েক বছর আগে সচিত্র 'বিচিত্রিতা' আবার প্রকাশিত হয়েছে প্রতিক্ষণ প্রকাশনা সংস্থা থেকে (সম্পাদক : আশিষ পাঠক, মে ২০১১)।

'বিচিত্রিতা'র মোট কবিতার সংখ্যা ৩১, ছবিও ৩১টি। প্রথম প্রকাশের সময় বইটির প্রচ্ছদ ও অনুচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পী নন্দলাল বসু। তিনি বিচিত্রিতার জন্য তিনটি ছবিও এঁকেছিলেন— 'পসারিণী', 'স্যাকরা' ও 'কন্যাবিদায়'। কাব্যের প্রারম্ভেই আছে 'আশীবর্বাদ' নামের একটি কবিতা যা আসলে 'পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ'। শান্তিনিকেতনে ১৯২০ সাল থেকেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন নন্দলাল, সেখানকার শিল্পশিক্ষক তিনি। তাঁর প্রথম ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে খুব সহজ ও মধুর সম্পর্ক ছিল নন্দলালের। কবির সঙ্গে চিন, জাপান, দ্বীপময় বহির্ভারতে ভ্রমণসঙ্গী হয়েছিলেন তিনি। সত্তর বছরের কবি যখন ছবির মধ্যে নতুন প্রাণ খুঁজে পাচ্ছেন তখনই তার আনন্দে নন্দলালকে আশীর্বাদ জানিয়ে লিখলেন,

''তোমারি খেলা খেলিতে আজি
উঠেছে কবি মেতে,
নববালক জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।
ভাবনা তা'র ভাষায় ডোবা,
মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা।
দেখাও তা'রে, ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে॥''

নন্দলালের 'পসারিণী' ছবিটি অপূর্ব। হাট থেকে ফেরার পথে ক্লান্ত পসারিণী গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে। সামনেই নামানো তার পসরা। দূরে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। বিকিকিনির লাভ-লোকসানের প্রতি সে যেন উদাসীন। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি এই পসারিণীকেই ব্যঞ্জিত করেছে :

''লাভের জমানো কড়ি,
ডালায় রহিল পড়ি,
ভাবনা কোথায় চলে যায়।''

সুকুমার সেন ছবিটি প্রসঙ্গে বলেছেন, ''যাইবার সময় ডাক ছিল হাটের। ফিরিবার মুখে কিন্তু গৃহ নয়, জলস্থল আকাশ পিছু টানিতেছে।''

ছবির যা নাম কবিতারও তাই নাম। ছবিগুলির মধ্যে সাতটি রবীন্দ্রনাথের আঁকা, বাকিগুলি তাঁর

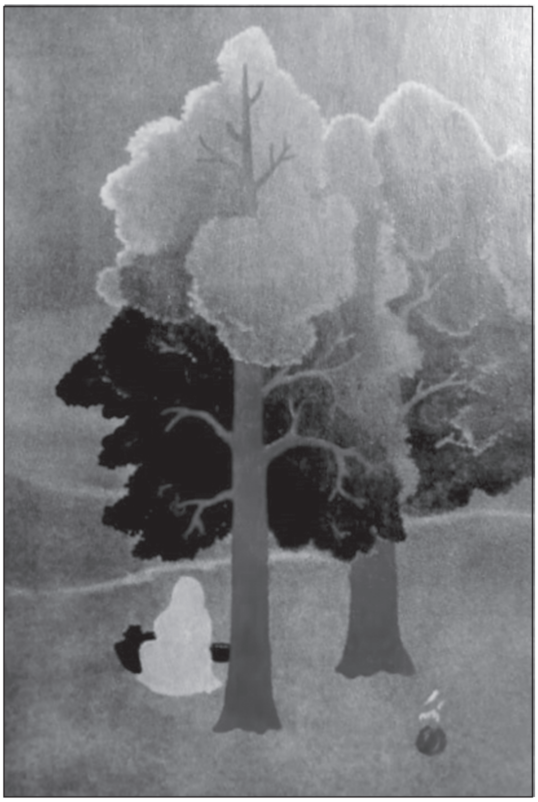

'পসারিণী'

সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কযুক্ত শিল্পীদের আঁকা। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর যাঁর ছবি এ-কাব্যে বেশি আছে তিনি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর ছবির সংখ্যা আট—'বধূ', 'কুমার', 'মরীচিকা', 'ছায়াসঙ্গিনী', 'ভীরু', 'বেসুর', 'কালো ঘোড়া' ও 'দ্বিধা'। অন্য শিল্পীরা হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১টি, 'অচেনা'), গৌরী দেবী (১টি, 'গোয়ালিনী'), সুরেন্দ্রনাথ কর (৪টি, 'আরশি', 'হার', 'সাজ', 'দ্বারে'), সুনয়নী দেবী (১টি, 'দান'), নিশিকান্ত রায়চৌধুরী (১টি, 'প্রকাশিতা'), রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (২টি, 'বরবধূ', 'যাত্রা'), ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার (১টি, 'পুষ্পচয়িনী'), প্রতিমা দেবী (১টি, 'নীহারিকা') ও মনীষী দে (১টি, 'অনাগতা')। ছবিগুলির নাম কবি নিজেই দিয়েছিলেন বলে অনুমান করেছেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। 'রবিরশ্মি' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি লিখেছেন, ''ছবির নামও বোধ হয় কবি দিয়েছেন, এবং কবির ব্যাখ্যা ছবিকে ছাপাইয়া কবিত্বে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে সামাজিক তত্ত্বে মিশিয়া রসালো ও অপূর্ব সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।''

'বিচিত্রিতা'র কবিতাগুলির রচনাকাল রবীন্দ্ররচনাবলীতে পাওয়া যায় (খণ্ড ৯)। তাতে দেখা যায় খুব কম সময়ের মধ্যে কবিতাগুলি লেখা। ৩২টির মধ্যে ১৬টি কবিতা ১৩৩৮-এর মাঘ মাসে লেখা। ১৯৩২-এর মধ্যে প্রায় সব কবিতা লেখা হয়ে গিয়েছে। 'স্যাকরা' কবিতাটি সব থেকে পুরোনো, যার রচনাকাল ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬৭—১৯৩৮) ছবিগুলি নিয়ে যে-কবিতাগুলি লেখা হয়েছে সেগুলি ১৩৩৮-এর ২ মাঘ থেকে ১৪ মাঘ অর্থাৎ মাত্র তেরো দিনে লেখা। রচনাকালের এই সংহতি কবিতার বিষয়ের মধ্যেও একটি সংহতি এনে দিয়েছে। এই সংহতি হল নারী ও সৌন্দর্য বিষয়ক। কাব্যের প্রথম কবিতা 'পুষ্প'। ছবিটি রবীন্দ্রনাথেরই আঁকা। বাম হাতে একটি লালপুষ্পের পানে চেয়ে আছে আলুলায়িতকুন্তলা এক নারী। ফুল ও নারী সৌন্দর্যেরই দুটি প্রতীক। এছাড়াও আছে প্রকৃতির সৌন্দর্য। 'স্যাকরা' কবিতাটিতে এসব কিছুই নেই বটে, কিন্তু স্যাকরা তো সৌন্দর্যেরই স্রষ্টা। তার অবরুদ্ধ জীবন সৌন্দর্য-সৃজনেই মগ্ন থাকে। কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি পাঠে সাধারণ সংসারচিত্রই ভেসে ওঠে : ''কার লাগি এই গয়না গড়াও/ যতন-ভরে।/ স্যাকরা বলে, একা আমার/ প্রিয়ার তরে।'' কিন্তু পাঠে যত মগ্ন হয় মন, ততই কবি আমাদের প্রবেশ করান গভীর থেকে গভীরতর ব্যঞ্জনায়। শেষ পঙ্‌ক্তিতে আমরা পাই অন্তরাত্মার স্পর্শ। ''শুধাই, একি একলা তারি/ চরণতলে।/ স্যাকরা বলে, তারে দিলেই/ পায় সকলে।'' এ-প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে অমিয় চক্রবর্তীর 'চেতন স্যাকরা' কবিতাটি। সেখানে অতীব নোংরা গলিতে চেতন স্যাকরার একঘেয়ে জীবন। অথচ কত সহজে সে বলতে পারে, ''সোনার সুন্দর, রুপোর রূপকার, এই নর্দমার দোকান দেহলিতে/ ধ্যান বানাই।'' নিজেকে চেনা এবং স্পষ্ট স্বীকারোক্তি : ''চন্দ্রহারে, দোলাই কানের

'স্যাকরা'

দুলে, আমার উত্তর মণিতে বাঁধি;/... শুধু জানি আগুন, আগুনের কাজ, সৃষ্টির আগুন, লাগলে প্রাণে/ তীব্র হানে বেদনা জাগবার, আর্টের আগুন, মরীয়াকে টানে।”

সুকুমার সেন লক্ষ করেছেন 'বরবধূ ও বিবাহ কয়েকটি ছবি ও কবিতার বিষয়'। এরকম ছবি ও কবিতাগুলি হল 'বধূ', 'কুমার', 'সাজ', 'প্রকাশিতা', 'বরবধূ'। এর সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে 'দ্বিধা' ও 'কন্যাবিদায়' নামের ছবি ও কবিতা দুটিকে। বিভিন্ন শিল্পীর ছবি নিয়ে লেখা কবিতা, তাই হয়তো কাব্যের নাম 'বিচিত্রিতা'। কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্যেও বিষয়গত এই সংহতি সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে।

'বিচিত্রিতা'র কবিতাগুলি যেন ছবির 'ভাষ্যচিত্রণ' —বলেছেন সুকুমার সেন। এক-একটি ছবিকে নিয়ে কবির কল্পনার স্রোত যেন অবারিত হয়ে উঠেছে। ফলে আমরা ছবিতে যা দেখতে পাই না, কবি তা দেখেছেন। চিত্রশিল্পী এবং কবি রবীন্দ্রনাথের এক মিলিত রূপ দেখতে পাওয়া যায় এখানে। সাধারণভাবে ছবির ক্ষেত্রে নাম দেওয়ার পক্ষপাতী রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে (২ পৌষ ১৩৩৮; এই সময়ই বিচিত্রিতার কাজ চলছে) রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, “ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।” 'বিচিত্রিতা'র পরবর্তী ছবি ও কবিতার বই 'চিত্রলিপি'র কবিতা ও ছবিগুলিতে কোনও নাম নেই। ছবি যেন অব্যক্ত কথা বলে, এখানে বলার চেয়ে না বলার ভাগ অনেক বেশি। ছবির এই না-বলা বাণীকে 'বাক্যঘেরা সীমা' দিতে কবির মন চাইত না। ছবিকে কথা দিয়ে ব্যাখ্যা করা কঠিন। এই কঠিন কাজটিই রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন 'বিচিত্রিতা'র কবিতাগুলির ক্ষেত্রে। এতে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই আঁকা সাতটি ছবি। এর মধ্যে চারটি নারীরূপ— 'পুষ্প', 'শ্যামলা', 'একাকিনী' ও 'ঝাঁকড়াচুল'। 'শ্যামলা' রবীন্দ্রনাথের খুব পরিচিত রূপ :

“যে-ধরণী ভালোবাসিয়াছি
তোমারে দেখিয়া ভাবি তুমি তারি আছ কাছাকাছি।
হৃদয়ের বিস্তীর্ণ আকাশে
উন্মুক্ত বাতাসে
চিত্ত তব স্নিগ্ধ সুগভীর।
হে শ্যামলা, তুমি ধীর,
সেবা তব সহজ সুন্দর,
কর্মেরে বেষ্টিয়া তব আত্মসমাহিত অবসর।”

'আত্মসমাহিত' বিষাদময় মুখমণ্ডলে চোখ দুটি খানিকটা যেন নিষ্প্রভ। 'ঝাঁকড়াচুল' কবিতায় কবি লিখেছেন এক পাগলিনীর কথা : “ঝাঁকড়া চুলের মেয়ের কথা কাউকে বলি নি,/ কোন্ দেশে যে চলে গেছে সে-চঞ্চলিনী।/ সঙ্গী ছিল কুকুর কালু,/ বেশ ছিল তার আলুথালু,/ আপনা-'পরে অনাদরে ধুলায় মলিনী।”

গগনেন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, অবনীন্দ্রনাথের বড়দাদা। তাঁদের পিতা গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন কবির খুল্লতাত গিরীন্দ্রনাথের পুত্র। গগনেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ দুজনেই ভারতীয় চিত্রকলার দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পী। গগনেন্দ্রনাথের ছবিতে সাদা ও কালো রঙের ব্যবহার এক ধরনের রহস্যময়তা নিয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছবির এই রহস্যময়তাকে যেন খানিকটা আলোকিত করার চেষ্টা করেছে। যেমন 'ভীরু' বা 'দ্বিধা' কবিতায় দেখা যায় অবগুণ্ঠনবতী নারীর

'বিচিত্রিতা'র প্রচ্ছদ : রবীন্দ্রনাথের আঁকা

ভীরুতা ও দ্বিধাময় চিত্তের কথা। 'ভীরু' কবিতায় নারীর ভীরুতাকে জয় করার কথা বলেছেন কবি :

''ওই শোনো কেঁপে ওঠে নিশীথরাত্রির অন্ধকার,
আহ্বান আসিছে বারংবার।
থেকো না ভয়ের অন্ধ ঘেরে,
অবজ্ঞা করিয়ো দুর্গমেরে,
জিনি লহো সত্যেরে তোমার।''

গগনেন্দ্রনাথের আটটি ছবিই নারীকেন্দ্রিক। 'কুমার' ছবিটিতেও দেখি কুমারকে বরণ করছে কয়েকজন নারী। গগনেন্দ্রনাথের ছবিতে যে-কিউবিজমের দেখা মেলে তা এই ছবিগুলিতেও আছে। 'কুমার' ছবিতে নারীদের সারি সারি দাঁড়ানোতে এ-জিনিস আছে।

রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী (১৮৯৩—১৯৬৯) শিল্পচর্চায় সুনাম অর্জন করেছিলেন। সতেরো বছর বয়সে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনে নন্দলালের ছাত্রী। তাঁর প্রথম দিকের ছবিতে জাপানি প্রভাব লক্ষ করা যায়। 'বিচিত্রিতা'র 'নীহারিকা' নামের ছবিটি তাঁর শিল্পভাবনার অসামান্যতা প্রমাণ করে। এই নামের কবিতাটিও বেশ দীর্ঘ। কবির ভাবনা এখানে যেন উচ্ছ্বসিত :

''সেদিন আমি এসেছিলাম একা তোমার আঙিনাতে।/ দুয়ার ছিল পাথর দিয়ে ঠেকা নিদ্রাঘেরা রাতে।/ যাবার বেলা সে-দ্বার গেছি খুলে/ গন্ধ-বিভোল পবন-বিলোল ফুলে,/ রঙ-ছড়ানো বনে—/ চঞ্চলিত কত শিথিল চুলে,/ কত চোখের কোণে।''

'পুষ্পচয়িনী' কবিতায় কোন সুদূর অতীতের মদির স্মৃতি :

''হে পুষ্পচয়িনী,/ ছেড়ে আসিয়াছ তুমি কবে উজ্জয়িনী/ মালিনীছন্দের বন্ধ টুটে।/ বকুল উৎফুল্ল হয়ে উঠে/ আজো বুঝি তব মুখমদে।/ নূপুররণিত পদে/ আজো বুঝি অশোকের ভাঙাইবে ঘুম।/ কী

'নীহারিকা'

'দ্বারে'

'সাজ'

সেই কুসুম/ যা দিয়ে অতীত জন্মে/ গনেছিলে বিরহের দিন।" 'অনাগতা' কবিতায় কবি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর অনাগত ভক্তের উদ্দেশে : "যে এখনো আসে নাই মোর পথে,/ কখনো যে আসিবে না আমার জগতে,/ তার ছবি আঁকিয়াছি মনে—/...সে যেন শেঁউলি ভাসে ক্ষীণ মৃদু স্রোতে.../ বিশ্বের সকল-শেষে/ যে আসিতে পারিত তবুও/ এল না কভুও।"

প্রতিমা দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিল্প-আলোচনা হত। ১৯৩০ সালে প্যারিসে কবির প্রথম চিত্রপ্রদর্শনীর পর তিনি প্রতিমা দেবীকে একটি চিঠিতে বলেছেন ছবি সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল আর আনন্দের কথা : "বস্তুত আজকাল আমার লেখার স্রোত একেবারে বন্ধ। ছুটি যখন পাই ছবি আঁকি—যারা সমঝদার তারা বলে এই হাল আমলের ছবিগুলো সেরা দরের। একটু একটু করে বুঝতে পারছি, এরা কাকে বলে ভালো, কেন বলে ভালো। তুমি যে একদা বলেছিলে, আমার ছবিগুলো ভালো জাতের, সে কথাটার পরখ হয়ে গেল, এরাও তাই বলচে।"

'বিচিত্রিতা' কাব্যটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও ছবির এক মিলিত ভাবনার প্রকাশ। অন্যের ছবির ভাবনাকে নিজের কবিতার মধ্যে প্রকাশের এই বিষয়টির জন্য কাব্যটি অভিনব। ছবির ভাবকে প্রকাশ করা যায় না বলে তিনি বহুবার বলেছেন। বলেছেন ছবিকে বাক্য দিয়ে ঘেরা যায় না। কিন্তু এখানে ছবিকে তো কবি বাক্য দিয়েই ঘিরেছেন। বোঝা যায় এই ঘেরাতে যতটা না বন্ধন আছে তার চেয়ে মুক্তি আছে বেশি। এক-একটি ছবিকে অবলম্বন করে কবির ভাবনা যেন অনন্তের পানে যাত্রা করেছে। বহুজনের নানারকম ছবির মধ্যেও একটি সৌন্দর্যের সংহতি এখানে মেলে। রবীন্দ্রনাথের একেবারে নিকটজন ও অনুরাগী যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই যে ভারতীয় চিত্রশিল্পে অসাধারণ মানুষ ছিলেন, 'বিচিত্রিতা' যেন সেকথারও প্রমাণ বহন করছে।

'দান'

'যাত্রা'